সংবাদ

তারিখ 31 OCT 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

সামসুল ইসলাম টুকু

বার বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনায় এবং এ নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে আন্দোলন হবার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রশ্নপত্র ছাপানো ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজনসহ সবার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তবে তা প্রাথমিক পর্যায়ে বা শিক্ষামন্ত্রীর ব্রেন স্টর্মিং পর্যায়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ইতিপূর্বেও তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যেখানে ছাপানো হয় সেখানে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এসব ঘোষণা ও আলোচনা শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনে শিক্ষামন্ত্রীর ইতিবাচক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং সেই পরিবর্তনের আশায় অপেক্ষমাণ। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি সাত বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। আগামীতে তিনি কতটুকু সময় পাবেন এবং শিক্ষাঙ্গনে কতটুকু পরিবর্তন করতে পারবেন তা দেখার বিষয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও প্যাকেটজাত করণে বিজি প্রেসকে অটোমেশনের আওতায় আনা হবে যেন কোন মানুষের স্পর্শে না আসে। কিন্তু যতদিন অটোমেশনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। ততদিন মুদ্রণ থেকে প্যাকেটজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত যারা সম্পর্কিত তাদের ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে কারণ প্রশ্নপত্র প্যাকেট হবার পর তা ফাঁস হবার সম্ভাবনা খুবই কম। শিক্ষামন্ত্রী জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতে দিনের সংখ্যা কমানোর ইঙ্গিত করেছেন। এটা যতিসত্বর এবং সম্ভব হলে আগামীতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে বাস্তবায়ন করা হোক। তাহলে পরবর্তী শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হবার বিষয়টি যেমন দ্রুততর হবে তেমনি সেশন দ্রুত করা সম্ভব হবে। দেড় মাস, দু'মাস ধরে পরীক্ষা পরিচালনা কোনক্রমেই ভালো না।

শিক্ষা বিভাগ একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের লালন করা সমস্যা যেমন ব্যাপক তেমনি সমস্যা সমাধানেও সময় সাপেক্ষ। তবে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে। বেশ কিছু সমস্যা আছে, যা শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনায় উঠে আসেনি। যে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন যেন সেগুলো আগামী সেমিনার কর্মশালায় আলোচনার বিষয় হিসেবে উঠে আসে ও সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়।

শিক্ষ অধিদফতরের নিয়ম অনুযায়ী যে কেন্দ্রে থিওরেটিকাল বা তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সে কেন্দ্রেই প্র্যাক্টিক্যাল বা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, যা গত ১০/১২ বছর এই যাবত নিয়মে চলে আসছে। ফলে পরীক্ষাকেন্দ্রে কলেজের শিক্ষকরা এর বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এর শিকার হচ্ছে মূলত এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষাকেন্দ্রে কলেজের শিক্ষকরা ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিজ্ঞানের ৪টি বিষয়ের প্র্যাক্টিক্যালের ২০০০ নম্বর তারাই নিশ্চিত করেন। ফলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করেন। শিক্ষার্থীরাও ৪টি বিষয়ের ৮টি পেপারের ২০০ নম্বর নিশ্চিত করতে মাসিক ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা বেতনে প্রাইভেট পড়ার জন্য পড়িমরি করে ছোটে। প্রায় দেড় দু'বছরে প্রত্যেক অভিভাবকদের কষ্টার্জিত প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকা ওই সকল শিক্ষকদের পকেটস্থ হয়। এর সবচেয়ে বড় কুফল হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব কলেজে ব্যবহারিক বিষয়টি পড়েও না এবং ব্যবহারিক কাজেও অংশগ্রহণ করে না। ফলে ব্যবহারিক বিষয়টি তাদের কাছে সারা জীবনের জন্য অজানায় থেকে যায়। কারণ পরীক্ষাকেন্দ্রে কলেজের শিক্ষকরা ওই নম্বর নিশ্চিত করেছেন। কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ এ ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এ দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে প্রতিবছর পরীক্ষাকেন্দ্র পরিবর্তন করতে হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর ২৫ এর স্থলে কমিয়ে ১০ এ আসতে হবে। পরীক্ষার এক্সটার্নাল হিসেবে জেলার বাইরের শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে এবং তারা তত্ত্বীয় শিক্ষক না হয়ে যেন ব্যবহারিক শিক্ষক বা ডেমোনেস্ট্রেটর হয়।

এইচএসসি বিজ্ঞান বিভাগের ৪টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য অন্তত পক্ষে ২৫ জনের লিখা ৮/১০টি করে বই এর অনুমোদন দিয়েছে এনসিটিবি। বইগুলোতে তত্ত্বীয় বিষয় এক হলেও প্রয়োগ পদ্ধতি, লিখন পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। ফলে শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের জন্য অন্ততপক্ষে ৫/৭টি বই কিনতে হয় এবং প্রয়োগ লিখন ও ব্যাখ্যা পড়তে গিয়ে হোঁচট খায়, হতবুদ্ধি ও অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। তখন গাইডের স্মরণাপন্ন হয়। ২ ডজন লেখকের ১ ডজন বই অনুমোদন দেবার ব্যাপারে এনসিটিবির অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু এইচএসসির শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়ন বা পণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এই পাণ্ডিত্যের বিষয়টি শুরু হেতে পারে অনার্স ক্লাস থেকে, যা মূলত গবেষণা কর্মেই কাজে লাগবে। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের মতামত হচ্ছে এসএসসি বিজ্ঞান যেমন ১টি করে বই অনুমোদন করা হয় তেমনি এইচএসসিতেও ১টি বই এর অনুমোদন দেয়া হোক। শিক্ষার্থীদের ওপর অনর্থক বইয়ের বোঝা চাপয়ে ক্ষতি বই লাভ হবে না।

ভুঁইফোড়ের মতো বেরিয়ে আসার দৌরাত্ম্যে শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধের লক্ষ্যে ২০১২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণঅলয় ১৫টি নীতিমালা গ্রহণ করেছিল। যার একটিও কার্যকর হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে হার মেনেছে। এই নীতিমালায় ছিল, ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন শিক্ষক কোচিং করতে পারবে না। তবে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান অভিভাকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে সর্বোচ্চ ৪০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে কোচিং করতে পারবেন। কোন শিক্ষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে পারবেন না। কোচিং এর জন্য কোন শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না এবং শিক্ষার্থীর নাম ব্যবহার করে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবেন না। কোচিং সেন্টারের নামে বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং বাণিজ্য করতে পারবেন না। সরকারের এমপিওবিহীন কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কোন কোচিং বাণিজ্যে যুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এসব নীতিমালা পদদলিত করেই কোচিং বাণিজ্য অব্যাহত গতিতে চলছে। এ নীতিমালা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের উৎসাহিত করতে বা আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। আজকাল দেখা যায় প্রাথমিক স্তর থেকে এইচএসএসসির পরীক্ষার্থীরা সকাল ৬টায় বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে দুই একটি কোচিং ক্লাস করে তারপর স্কুল কলেজের ক্লাস করে। বিকেল চারটায় আবার অন্ততপক্ষে দুটি কোচিং ক্লাস করে সন্ধ্যা ৬/৭টায় বাড়ি ফেরে। শিক্ষার্থীরা যদি কোচিং-এ এত সময় দিতে পারে তবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কোচিংয়ের কেন সময় দিতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবে। নিশ্চয় সেখানে কোন সমন্বয়হীনতা রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে শক্ত ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষার্থী; অভিভাবক, শিক্ষক ও অর্থের সমন্বয় ঘটলেই সেটা সম্ভব এবং সেটা করতে পারলেই কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হবে।

সচেতন হবার পর থেকেই শুনে আসছি, প্রত্যেক অভিভাবক চান তার ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুল কলেজে ভর্তি হোক। এজন্য অভিভাবকরা ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে সামর্থ্যবান অভিভাবকরা। তাদের আশা ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুল কলেজে পড়বে, ভালো রেজাল্ট হবে, ভালো চাকরি করবে। কিন্তু বরাবরই ভালো স্কুল কলেজের সংজ্ঞা কী, এ বিষয়টি আমাকে পীড়িত করে। ঝকঝকে তকতকে ভবন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত শিক্ষক এমন হলেই কি সেটা ভালো স্কুল? না সেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট ভালো তাই 'ভালো স্কুল'? প্রথম প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দ্বিতীয় প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আসলে শহরের ভালো নামক স্কুল ও সরকারি স্কুল কলেজে বেছে বেছে মেধাবী ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। আর এ কারণে এই শিক্ষঅ প্রতিষ্ঠানগুলোর রেজাল্ট ভালো হয়। এজন্য কৃতিত্বের দাবিদার ঐ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা। এখানে ভালো স্কুলগুলোর কোন কৃতিত্ব নেই, এমনকি শিক্ষকদেরও না। কারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা পড়ে বলেই রেজাল্ট ভালো করে। এসব শিক্ষার্থীরা কোন অজোপাড়া গাঁয়ের স্কুল থেকে পরীক্ষা দিলেও একই ফল পাওয়া যেত। সুতরাং ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ভালো এমন বলার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। আসলে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার কৌশলে তৈরি করা হয়। যদি শিক্ষা অধিদফতর এমন আদেশ জারি করত যে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট স্কুল কলেজেই ভর্তি হবে তাহলে সব স্কুল কলেজগুলো স্কুল কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহলে এই ভর্তির হিড়িক আর ভর্তিবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেত। শুধু সরকার ও স্থানীয় সুধীজনদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। তাহলে ভালো স্কুল বলে গৌরবের কিছু থাকত না এবং খারাপ স্কুল হওয়ার হীনম্মন্যতাও থাকত না।

যেহেতু সৃজনশীল প্রশ্নেই পরীক্ষা চলছে সেহেতু প্রশ্ন যেমন সহজ হয় না তেমনি উত্তর দানও সহজ হয় না। শিক্ষার্থীকে টেক্সট বইটি দিলেও তা দেখে সহজে উত্তর দিতে পারবে না। উত্তর দিতে হলে শিক্ষার্থীকে টেক্সট বই অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়তে হবে এবং মর্মার্থ উদ্ধার করতে হবে, তবেই উত্তর দেয়া সম্ভব হবে। তাই টেক্সট বই দেখে পরীক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রচলন করলে শিক্ষার্থীরা নোট বই গাইড বই পড়বে না বরং টক্সট বই পড়তে মনোযোগী হবে। অন্যদিকে এমসিকিউ প্রশ্নের নম্বর ৫০ এর স্থলে ২০তে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে যেন এমসিকিউ প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের পাস করার সিঁড়ি না হয়। এতে নোট বই আর গাইড বই বাণিজ্য কমে যাবে।

গত কয়েক বছরে শিক্ষা বোর্ডের অলিখিত নির্দেশ এবং সরকারের শিক্ষার হার বাড়ানোর অপকৌশলে জিপিএ প্রাপ্তদের সংখ্যা ও পাসের হার গাণিতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে কয়েক লাখ মানহীন বেকার যুবক বৃদ্ধি পেয়েছে। এরা না পারবে কুলি মজুর হতে না পারবে ভালো কোন চাকরি করতে। এ অবস্থা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। তাই এ প্রবণতা চিরতরে বন্ধ করাই হবে শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক।

দেশে ক্যাডেট, কিন্ডার গার্টেন, সাধারণ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ অবস্থাগুলোতে রয়েছে সরকারের চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। আর একই সমান শিক্ষিত হয়েও এই সামাজিক বৈসম্যের শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। তাই ক্যাডেট, কিন্ডারগার্টেন, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বিলোপ করে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাকে সমন্বিত করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বোর্ডের অধীনে একই সিলেবাসে লেখাপড়ার বা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলে যেমন বৈষম্য দূর হবে তেমনি সরকারের আর্থিক সাশ্রয় হবে। মাধ্যমিক স্তর পার হবার পর শিক্ষা পদ্ধতির বিন্যাস হোক আর শিক্ষার্থীরা বেছে নিক তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবন।

[লেখক : সাংবাদিক]